ভার্মি কম্পোস্ট সাধারণ তথ্য

ভুমিকা

উদ্ভিদ ও প্রানীজ বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুকে কিছু বিশেষ প্রজাতির কেঁচোর সাহায্যে কম সময়ে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের জৈব সারে রুপান্তর করাকে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার বলে। ভার্মি-কম্পোস্ট বা কেঁচোসার নিয়ে কাজ করেছে বহুদিন থেকেই বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা। আবার অনেক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্র্যাক, কারিতাসসহ অনেক এনজিও ভার্মি-কম্পোস্ট তৈরিসহ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে বাজারজাতও করছে। কিন্তু ভার্মি-কম্পোস্ট এখনো এদেশের কৃষকের কাছে সুপরিচিত নয়।

কোঁচোর ইতিহাস

কেঁচো কতদিন আগে পৃথিবীতে আর্বিভাব হয়েছিল, তার সঠিক তত্ত্ব নেই, কারণ কেঁচোর শরীর খুব নরম এবং সহজেই পচে যায়। তাই জীবাশ্ব সৃষ্টি হওয়া কঠিন। এর বিবর্তনীয় অবস্থান পতঙ্গের নীচে। কেঁচোর আর্বিভাব সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ সমাদৃত। বিজ্ঞানী জে. স্টিফেনসনের (১৯৩০) মতে "কেঁচো আজ থেকে প্রায় ১২ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে আর্বিভাব হয়েছিল"। অর্থাৎ দ্বিবীজপত্র গাছ (dicotyledonous) আর্বিভাব হওয়ার পরে। অন্য একদল বিজ্ঞানী আরো পূর্বে (প্রায় ৫৭ কোটি বছর) আবির্ভাবের কথা বলেন।

কেঁচোর প্রজাতি

সারা বিশ্বে ৪,২০০-এর বেশি প্রজাতির কেঁচো আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে ৫০০-র কিছু বেশি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। যেসব স্থানে দেখা যায় না, তা হল-সমুদ্র, মরুভুমি, সর্বদা বরফাবৃত স্থান এবং যেখানে কোন রকম গাছপালা নেই। অবস্থান অনুসারে কেঁচোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়ঃ
১) পেরিগ্রাইন (Perigrine): যারা সব রকম পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে এবং সর্বত্র বিরাজ করে।
২) এনডেমিক (Endemic): যারা কিছু নির্দিষ্ট স্থানে বর্তমান। এরা সব রকম পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে না।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ চারটি প্রজাতির কেঁচো, সার তৈরীর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-(১) আইসেনিয়া, (২) ইউড্রিলাস, (৩) ফেরেটিমা এবং (৪) পেরিওনিক্স। আইসেনিয়া ফিটিডা (Eisenia foetida) নামক কেঁচোটি মূলতঃ এসেছে জার্মানি থেকে। সম্ভবত সারা বিশ্বে এই প্রজাতির কেঁচোটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সর্বত্র এটি পাওয়া যায়। বিভিন্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় বেঁচে থাকতে পারে। এরা দ্রুত বাড়ে। গড় আয়ু ৭০ দিন। অতি সহজেই এই প্রজাতির কেঁচো উৎপাদন করা যায়। কিছু প্রজাতির কেঁচো আছে, যারা মাটির উপরের স্তরে (২০-৩০ সেমি) থাকতে ভালবাসে, তাদের এপিগি (epige) বলে। মাটির গভীরে (>৩০ সেমি) থাকে, তাদের এন্ডোগি (endoge) বলে। মাটির উপরের দিকে বসবাসকারী কেঁচো সার তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।
ইউড্রিলাস ইউজেনি (Eudrilus Eugenie) প্রজাতির কেঁচোর আবির্ভাব ঘটেছে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে। দক্ষিণ ভারতের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। গায়ের রং তামাটে, লাল ও গাঢ় বেগুনী রঙের হয়। এই কেঁচোও দ্রুত বাড়ে এবং সার তৈরীর ক্ষেত্রে উপযোগী। কেঁচোর গড় দৈর্ঘ্য ৩২-১৪০ মিমি, ব্যাস ৫-৮ মিমি, শরীর ১৪৫-১৯৬টি খন্ডে বিভক্ত। গড়ে প্রতিদিন ১২ গ্রাম জৈব বস্তু গ্রহন করে। প্রায় ৪০ দিনে পূর্নতা লাভ এবং পুর্ণতায় আসার সাতদিন পর প্রতিদিন ১টি করে ডিম থেকে ১৬-১৭ দিন পর বাচ্চা কেঁচো (১-৩ টি) জন্ম নেয়। ঠান্ডা ও গরম সহ্য করতে পারে এবং প্রায় ১-৩ বছর বাঁচে।
পেরিওনি এ কাভেটাস (Preionyx excavatus) কেঁচোর আদি নিবাস হল অস্ট্রেলিয়া। এই কেঁচোর পিঠের উপর সামনের অংশের রং ঘন বেগুনী থেকে লালচে-বাদামী এবং নীচের অংশ হালকা রঙের হয়। দৈর্ঘ্য ২৩-১২০

মিমিঃ ব্যাস ২.৫ মিমিঃ। অধিক আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। পচা পাতা, কাঠ এবং বহমান নদীতেও পাওয়া যায়। জীবনকাল গড় ৪৬ দিন। পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ২১-২২ দিনে এবং গুটি বা ডিম দিতে থাকে ২৪ দিন পর, প্রতিদিন ১ টি করে। গুটি প্রতি ১-৩ টি কেঁচো যাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্মিকম্পোষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং উন্নত মানের ভার্মিকম্পোট তৈরী করতে ইউড্রিলাস ইউজেনি এবং আইসেনিয়া ফিটিডা-কে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। পশ্চিমা দেশ গুলিতে আবার ইউড্রিলাস ফিটিডার ব্যবহার বেশি। ইউড্রিলাস ইউজেনি কেঁচোর সহনশীলতা বেশি। বিভিন্ন জৈব কীটনাশক যেমন-নিম খোল, মহুয়া খোল, গ্লাইরিসিডিয়া, ইউপাটোরিয়াম ইত্যাদির প্রতি অনেক বেশি সহনশীলতা দেখায়।

কেঁচোর গুরুত্ব

বিজ্ঞানী চালর্স ডারউইন সর্বপ্রথম কেঁচোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সকলকে অবগত করান। তিনি বলেন ‘‘কেঁচো ভুমির অন্ত্র এবং পৃথিবীর বুকে উর্বর মাটি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালন করে, যার উপর আমরা আমাদের ফসল উৎপাদন করি”। এই অতি সাধারন, ক্ষুদ্র প্রানীটি পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে সোনা ফলাতে পারে, কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্টে রুপান্তরিত করে। কেঁচোর উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ গুলি হল- মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে খনন, চলন, আহার এবং পাচ্য পদার্থ মল রুপে নিষ্কাশন। এইসব কার্যকলাপ নির্ভর করে মাটির অম্লতা (pH), জৈব পদার্থের পরিমান, পানি, তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির (species) কেঁচোর কার্যকলাপ বিভিন্ন। সুতরাং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সব ধরণের কেঁচো একই রকম ভূমিকা পালন করে না। খনন ও চলন ক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি কর্ষণ করতে পারে, অপর দিকে কেঁচো ৩ মিটার পর্যন্ত কর্ষণ করে, গাছ পালার কোনরকম ক্ষতি সাধন না করে। ফলে মাটিতে ছিদ্রের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাটির গহবরে পানি প্রবেশ করতে সাহায্য করে। মাটির তলায় (subsoil) পানির মাত্রা বৃদ্ধি পায়, মাটির ভিতরে তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা এবং বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। কেঁচো, মাটি ও জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে। আহার প্রক্রিয়া চলাকালীন অনবরত শরীরকে আর্দ্র রাখে। ফলে সর্বদা অতি সামান্য মাত্রায় হলেও মাটির আর্দ্রতা বাড়ায়। সেই সাথে ইউরিয়ার (urea) পরিমান বৃদ্ধি পায়। কেঁচো তার পোষ্টিক তন্ত্রের সাহায্যে মাটির কনাকে ভেঙ্গে দেয় এবং মাটির ভেতরে অবস্থিত গাছের খাদ্য উৎপাদন গুলিকে সহজ লভ্য করে তোলে। মাটি কণা ছোট হওয়ার ফলে আয়তন বেড়ে যায় মাটির পানিধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলন মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কেঁচোর উপস্থিতিতে মাটিতে বায়ু চলাচল ক্ষমতা ৮-৬৭% বৃদ্ধি পেতে পারে। আহার পর্বের পর যে পাচ্য পদার্থ মলরুপে নির্গমণ হয় তাকে কাস্ট (cast) বলে। এই কাস্টের ভিতর জীবাণু সংখ্যা এবং তার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। দেখা গেছে, পারিপার্শ্বিক মাটির তুলনায় কাস্টের মধ্যে জীবাণু সংখ্যা প্রায় হাজার গুণ বেশি। এই কাস্টের উপরে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক উৎপাদনকারী ব্যাক্টেরিয়া জীবাণু বেশি থাকায় মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ কাস্টের কারণে মাটি থেকে গাছে ৬ শতাংশ নাইট্রোজেন এবং ১৫-৩০ শতাংশ ফসফরাস হতে দেখা গেছে। এছাড়াও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য উপাদান যেমনঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি, গাছে বেশি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। কেঁচোর উপস্থিতিতে জৈব পদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেন অনুপাত (C:N ratio) প্রায় ২০:১ এর কাছাকাছি হয়। এই অনুপাতে গাছ সহজেই কম্পোস্ট থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

ভার্মিকম্পোস্ট প্রস্তুত প্রণালী

কেঁচোর বৈশিষ্ট্য

কেঁচোর সার তৈরি করতে নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচো বেছে নেওয়ার জন্য তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে নেওয়া আবশ্যক। যেমনঃ

১) শীত ও গ্রীষ্ম উভয় আবহাওয়াতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা।
২) সব রকম জৈব বস্তু থেকে খাবার গ্রহণ করার সামর্থ্য।
৩) কেঁচো যেন রাক্ষুসে প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ প্রচুর আহার করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৪) অন্যান্য প্রজাতির কেঁচোর সাথে মিলেমিশে বাস করা।
৫) জৈব দ্রব্য পাওয়ার সাথে সাথে বা অল্প সময়ের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠা এবং সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করা।
৬) রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবং প্রতিকুল অবস্থানে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়া।
৭) দ্রুততার সাথে বংশ বিস্তার করা এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটানো।

উপকরণ

যে সব দ্রব্যকে কেঁচো সারে পরিণত করা যায় তা হলঃ (১) প্রাণীর মল-গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, ছাগল-ভেড়ার মল ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গোবর উৎকৃষ্ট; মুরগীর বিষ্ঠায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে যা পরিমাণে বেশি হলে কেঁচোর ক্ষতি হতে পারে। তাই খড়, মাটি বা গোবরের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভাল। (২) কৃষিক বর্জ্য-ফসল কাটার পর পড়ে থাকা ফসলের দেহাংশ যেমন-ধান ও গমের খড়, মুগ, কলাই, সরষেও গমের খোসা, তুষ, কান্ড, ভুষি, সব্জির খোসা, লতাপাতা, আখের ছোবড়ে ইত্যাদি। (৩) গোবর গ্যাসের পড়ে থাকা তলানি বা স্লারী (Slurry)। (৪) শহরের আবর্জনা এবং (৫) শিল্পজাত বর্জ্য যেমনঃ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বর্জ্য। যে সব বস্তু ব্যবহার করা উচিত নয়, তা হলঃ পেঁয়াজের খোসা, শুকনো পাতা, লংকা, মসলা এবং অম্ল সৃষ্টিকারী বর্জ্য যেমনঃ টমেটো, তেঁতুল, লেবু , কাঁচা বা রান্না করা মাছ মাংসের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। এছাড়া অজৈব পদার্থ যেমনঃ পাথর, ইটের টুকরা, বালি, পলিথিন ইত্যাদি।

স্থান নির্বাচন

সার তৈরী করতে প্রথমে ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গা বাছতে হবে, যেখানে সরাসরি সূর্যালোক পড়বে না এবং বাতাস চলাচল করে। উপরে একটি ছাউনি দিতে হবে। মাটির পাত্র, কাঠের বাক্র, সিমেন্টের পাত্র, পাকা চৌবাচ্চা বা মাটির উপরের কেঁচো সার প্রস্তুত করা যায়। লম্বা ও চওড়ায় যাই হোকনা কেন উচ্চতা ১-১.৫ ফুট হতে হবে। পাত্রের তলদেশে ছিদ্র থাকতে হবে যাতে কোনভাবেই পাত্রের মধ্যে জল না জমে। একটি ৫´ ৬" ও ৩´ ২" চৌবাচ্চা তৈরী করে নিতে পারলে ভাল হয়।

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে চৌবাচ্চা বা পাত্রের তলদেশে ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সেমি ইঁটের টুকরা, পাথরের কুচি ইত্যাদি দিতে হবে। তার উপরে ১ ইঞ্চি বালির আস্তরণ দেওয়া হয় যাতে পানি জমতে না পারে। বালির উপর গোটা খড় বা সহজে পচবে এরকম জৈব বস্তু বিছিয়ে বিছানার মত তৈরি করতে হয়। এর পর আংশিক পঁচা জৈব দ্রব্য (খাবার) ছায়াতে ছড়িয়ে ঠান্ডা করে বিছানার উপর বিছিয়ে দিতে হবে। খাবারে পানির পরিমাণ কম থাকলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে যেন ৫০-৬০ শতাংশ পানি থাকে। খাবারের উপরে প্রাপ্ত বয়স্ক কেঁচো গড়ে কেজি প্রতি ১০ টি করে ছেড়ে দিতে হবে। কেঁচোগুলি অল্প কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর এক মিনিটের মধ্যেই খাবারের ভেতরে চলে যাবে। এরপর ভেজা চটের বস্তা দিয়ে জৈব দ্রব্য পুরাপুরি ঢেকে দেওয়া উচিত। বস্তার পরিবর্তে নারকেল পাতা ইত্যাদি দিয়েও ঢাকা যেতে পারে। মাঝে মাঝে হালকা পানির ছিটা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে অতিরিক্ত পানি যেন না দেওয়া হয়। এভাবে ২ মাস রেখে দেওয়ার পর (কম্পোস্ট) সার তৈরি হয়ে যাবে। জৈব বস্তুর উপরের স্তরে কালচে বাদামী রঙের, চায়ের মত দানা ছড়িয়ে থাকতে দেখলে ধরে নেওয়া হয় সার তৈরি হয়ে গেছে। এই সময়ে কোন রকম দুর্গন্ধ থাকে না।
কম্পোস্ট তৈরি করার পাত্রে খাবার দেওয়ার আগে জৈব বস্তু, গোবর, মাটি ও খামারজাত সার (FYM) নির্দিষ্ট অনুপাত (৬ : ৩ : ০.৫ : ০.৫) অর্থাৎ জৈব আবর্জনা ৬ ভাগ, কাঁচা গোবর ৩ ভাগ, মাটি ১/২ ভাগ এবং খামার

জাত সার (FYM) ১/২ ভাগ, মিশিয়ে আংশিক পচনের জন্য স্তুপাকারে ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ঐ মিশ্রিত পদার্থকে কেঁচোর খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে, একটি ১ মিটার লম্বা, ১ মিটার চওড়া ও ৩ সেমি গভীর আয়তনের গর্তের জন্য ৪০ কিলোগ্রাম খাবারের প্রয়োজন হয়। এরকম একটি গর্তে এক হাজার কেঁচো প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকে কম্পোস্ট হতে সময় বেশি লাগে (৬০-৭০ দিন)। পরে মাত্র ৪০ দিনেই সম্পন্ন হয়। কারণ ব্যাক্টেরিয়া ও কেঁচো উভয়েরই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। তথ্য অনুসারে ১ কেজি বা ১০০০ টি কেঁচো, ৬০-৭০ দিনে ১০ কেজি কাস্ট তৈরি করতে পারে। এক কিলোগ্রাম কেঁচো দিনে খাবার হিসাবে ৫ কিলোগ্রাম সবুজসার (& Green leaf manure) খেতে পারে। তার জন্য ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতার বজায় রাখা আবশ্যক। প্রায় ৮০০-১০০০ কেঁচোর ওজন হয় ১ কিলোগ্রাম। এই পরিমাণ কেঁচো সপ্তাহে ২০০০-৫০০০ টি ডিম বা গুটি (Cocoon) দেয়। পূর্ণাঙ্গ কেঁচোর জন্ম হয় ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে।

সমস্যা ও সমাধান

কেঁচো সার তৈরি করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা নিম্নে দেওয়া হলঃ
সমস্যা কারণ সমাধান
দুর্গন্ধ ও মাছি এবং পোকার আবির্ভাব ক) বিছানা অতিরিক্ত ভেজা।
খ) কেঁচোর খাবার সরাসরি বায়ুমন্ডের সংস্পর্শে আসা।
গ) তৈলাক্ত বা অপছন্দের খাবার।
ঘ) পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল না করা।
ঙ) অতিরিক্ত খাবার দেওয়া। ক) বিছানা থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিছানাকে কিছু দিয়ে আলগা করা।
খ) খাবার ঢেকে দেওয়া ।
গ) অপ্রয়োজনীয় খাবার সরিয়ে দেওয়া।
ঘ) কিছু দিন খাবার দেওয়া বন্ধ রাখা।
কেঁচো মরে যাওয়া ক) অত্যাধিক শুকনো বা ভেজা খাবারের অভাব।
খ) বিছানার আস্তরণ শেষ হয়ে যাওয়া।
গ) বেশি ঠান্ডা বা গরম।
ঘ) বিষাক্ততা। ক) সহনশীল স্থানে কম্পোস্টের জায়গা বদল করা।
খ) খাবার ও বিছানার বস্তুগুলি ভালভাবে দেখে নেওয়া যেন ক্ষতিকারক কোন বস্তু না থাকে।
ছত্রাক ক) অম্লতা সৃষ্টি। ক) লেবুর খোসা, তেঁতুল ইত্যাদি অম্লতা সৃষ্টিকারী বস্তু সরিয়ে ফেলা।
নীচ দিয়ে পানি গড়িয়ে যাওয়া ক) অতিরিক্ত পানি ব্যবহার। ক) অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়া। বিছানা করার জৈব বস্তু মিশিয়ে দেওয়া, দু-এক দিন উপরের ঢাকনা সরিয়ে রাখা।
কেঁচো পালিয়ে যাওয়া ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ক) উপরের কারণগুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিকার নেওয়া।

কোঁচো সার উৎপাদনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব
কেঁচোসার উৎপাদন ও বিক্রয়ের একটি আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলঃ
ব্যয়
বিষয়/বস্তু পরিমাণ মূল্যহার মোট মূল্য
প্রথম বছর
১) চৌবাচ্চ নির্মাণ (৫´ x ৩´ x ১.৫´) ৪ ২০০০.০০ ৮০০০.০০
২) ছাউনী ১ ১০০০.০০ ১০০০.০০
৩) কেঁচো সংগ্রহ ৪০০ ২৫০.০০/হাজার ১০০০.০০
৪) গোবর ও আবর্জনা সংগ্রহ ৮ টন ৫০০.০০/টন ৪০০০.০০
মোট ১৪০০০.০০

দ্বিতীয় বছর
১) গোবর ও আবর্জনা সংগ্রহ ১২ টন ৫০০.০০/টন ৬০০০.০০
মোট ৬০০০.০০

চৌবাচ্চা নিমার্ণের আনুমানিক খরচের বিবরণ
এরকম একটি চৌবাচ্চা নিমার্ণের আনুমানিক খরচের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ
বিষয়/বস্তু পরিমাণ মূল্যহার (টাকা) মোট মূল্য (টাকা)
১) ইট ২০০টি ৬.০০ ১২০০.০০
২) মাটি ৫০০ সি.ফিট ৪.০০ ২০০০.০০
৩) সিমেন্ট ১ বস্তা ৩৫০.০০ ৩৫০.০০
৪) বালি ৮ বস্তা ১০০.০০ ৮০০.০০
৫) মিস্ত্রী ও শ্রমিক ১+১ ৩০০.০০+১৫০.০০ ৪৫০.০০
৬) বাশঁ /কাঠের খুঁটি ৬ টি ৬০.০০ ৩৬০.০০
৭) খড় ২ কুইঃ ২০০০.০০ ২০০০.০০
৮) শ্রমিক ২ জন ১৫০.০০ ৩০০.০০
৯) তার ৬ কেজি ৫০.০০ ৩০০.০০
মোট ৭৭৬০.০০

আয়
প্রথম বছর চারটি (৫´ x ৩´ x ১.৫´) চৌবাচ্চা থেকে ৮ টন জৈব আবর্জনা থেকে সহজেই ২ টন কেঁচো সার উৎপাদন করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতি কেজি ৪০ টাকা হিসাবে ২ টন কেঁচো সার থেকে প্রথম বছর ৮০,০০০.০০ টাকা বিক্রয় হবে। দ্বিতীয় বছর উৎপাদন হার আরো বৃদ্ধি পাবে কারণ কেঁচোর সংখ্যা কয়েক গুন বেড়ে যাবে এবং স্বল্প সময়েই (৪৫ দিনে) সার উৎপাদন সম্ভব হবে। দ্বিতীয় বছর ১২ টন আবর্জনা থেকে ৩ টন কেঁচোসার উৎপাদন করা যাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বছর মোট বিক্রয় হবে ১২০,০০০.০০ টাকা। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কেঁচোসার করতে গেলে একটি ছাউনির নীচে (৫´ x ৩´ x ১.৫´) মাপের ৫-৬ টি চৌবাচ্চায় নুন্যতম ২০০০টি কেঁচো ছাড়লে ৪০০ কেজি আবর্জনা থেকে ৫০-৬০ দিনের মধ্যে ১০০ কিলোগ্রাম কেঁচোসার বিক্রি করে গ্রামের যুবকেরা সহজেই স্বনির্ভর আয়ের সংস্থান করতে পারেন। বর্তমানে প্রেক্ষাপটে এ দেশের সরকার সারের উপর বিশাল অংকের ভর্তুকি দেওয়ার পরও ইউরিয়া-১২ টাকা, এম.পি-২৪ টাকা ও টি.এস.পি-২৬ টাকা কেজি দরে বিক্রয় হচ্ছে। আবার অনেক সময় অতি উচ্চ মূল্য দিয়েও সময়মত ও পরিমান মতো সার কৃষকের হাতে পৌঁছায় না। এ জন্য আমরা যাদ ভার্মি-কম্পোস্ট বা কেঁচো সার কৃষকদের/যুবকদের সচেতনতার মাধ্যমে তৈরি করতে পারি, তাহলে রাসায়নিক সারের উপর চাপ অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সাথে সাথে উৎপাদনকারীর আয়ের পথ খুজে পাবে, যাতে করে সে স্বনির্ভর হতে পারে।

ভার্মি কম্পোস্টের ব্যবহার

ভার্মিকম্পোস্ট সব প্রকার ফসলে যে কোন সময়ে (any stage of the crop growth) ব্যবহার করা যায়। সবজি এবং কৃষি জমিতে ৩-৪ টন প্রতিহেক্টরে ও ফল গাছে গাছ প্রতি ৫-১০ কিলোগ্রাম হারে ব্যবহার করা হয়। ফুল বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিমাণ আরো বেশি ৫-৭.৫ কুইন্টাল এক হেক্টর জমিতে। জমির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বজায় রাখার জন্য জৈব সার ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ছে। এদেশের মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন এ ব্যাপারে। তাই ভার্মি-কম্পোস্ট উৎপাদন ও তার ব্যবহার এক মূলবান ভুমিকা পালন করতে চলেছে আগামী দিনগুলিতে।